জয়নুল আবেদীন

সবার জন্য শিক্ষা : লক্ষ্য অর্জন হবে কি?

২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারগুলোর এক সম্মেলনে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচি বাস্তবায়নের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত প্রত্যেকটি শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে মৌলিক শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিটি দেশের সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২০১৫ সালের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর প্রতিটি শিশুকে স্কুলগামী করা এবং নিরক্ষরপ্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতা দান করে নিরক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ঘোষণাকে ডাকার ঘোষণা বলে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের শিক্ষার হার নিয়ে বিশ্বব্যাংক, জাতিসংঘ এবং সরকারি তথ্যের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। শুধুমাত্র অ, আ, ক, খ জানা ব্যক্তিকেই শিক্ষিত বা সাক্ষরতা জ্ঞানসম্পন্ন বলা যাবে না। ইউনেস্কো সাক্ষরতার যে সংজ্ঞাটি দিয়েছে তা হচ্ছে, যে কোন ভাষায় একটি চিঠি পড়তে লিখতে ও বুঝতে পারা এবং সাধারণ অংক বা সংখ্যা জ্ঞানের ধারণা থাকা। সরকারি হিসাবে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষিতের হার ৬৪% বলা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে যে তারা নিরূপণ করেছেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। ইউনেস্কো আহসানিয়া মিশনসহ কয়েকটি এনজিওর সহায়তায় সাক্ষরতার হার নির্ধারণ করেছে ৪২%। ২০০১ সালে আদম শুমারি করা হয়, যার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালে। তাতেও সাক্ষরতার হার দেখানো হয়েছে ৪১.৮%৺ বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২৮% পড়তে সক্ষম, ১৩% লিখতে এবং ৩৭% লোক মুখে মুখে হিসাব করতে পারে। সুতরাং সাক্ষরতার হার নিয়ে বিভিন্ন সময় সরকারি তথ্যের কোন ভিত্তি নেই। সারা দুনিয়ায় প্রায় ১৩ কোটি শিশু এবং ৮৯ কোটি বয়স্ক ব্যক্তি নিরক্ষর। শিশুদের ক্ষেত্রে সাত বছর বয়সের অধিক বয়স্ক যারা স্কুলে যায় না তাদের ধরা হয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৭ মিলিয়ন শিশু স্কুলে যায় না এবং ৮.৭ কোটি প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি নিরক্ষর। বাংলাদেশের ৭ মিলিয়ন শিশুকে স্কুলগামী করা ও ৮.৭ কোটি নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষরতা দান করতে শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে ওই মন্ত্রণালয়টি প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ভুক্ত করে; কিন্তু তাতে কাজের কোন অগ্রগতি হয়নি বরং বয়স্ক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বিগত সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বঙ্গবন্ধুর সরকার যে ৩৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে জাতীয়করণ করেছিল, তার পরে আর কোন সরকারি প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে বেশ কিছু সংখ্যক বেসরকারি স্কুল, স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি স্কুল, রেজিস্টার্ড প্রাইমারি, মাদ্রাসা ও কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্ডারগার্টেন স্কুলে নিম্নবিত্তের সন্তানেরা ভর্তি হতে পারে না। তবে মাদ্রাসা বৃদ্ধি পেয়েছে অস্বাভাবিক গতিতে। মাদ্রাসা বৃদ্ধির হার স্কুলের তুলনায় ২:৮।

আন্তঃসরকার স্বাক্ষরিত ঘোষণা অনুযায়ী দেশকে ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত করা এবং সব শিশুকে স্কুলগামী করতে হলে ব্যাপক পরিকল্পনা ও অর্থব্যয় করতে হবে। শুধু সব শিশুকে স্কুলগামী করতে হলে আরও প্রায় ৩০ হাজার প্রাইমারি স্কুল এবং দেড় লাখ শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। জাতিসংঘ জিএনপি'র ৭% শিক্ষা খাতে ব্যয়ের সুপারিশ করেছে, সেক্ষেত্রে বিগত কয়েকটি বাজেটে শিক্ষা খাতে আমাদের ব্যয় বরাদ্দ জাতীয় আয়ের ২.৩-২.৫% বেশি নয়। এক্ষেত্রে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি

দেশের শিক্ষা খাতে ব্যয়ের একটি তুলনামূলক চিত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে ভারত জিএনপি'র ৪৮%, পাকিস্তান ২.৭%, বাংলাদেশ ২.৩%, নেপাল ২.৯%, শ্রীলংকা ৩.২%, মালদ্বীপ ৮.১, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ৪.৫, মালয়েশিয়া ৫.৩, সিঙ্গাপুর ৩.৩%, থাইল্যান্ড ৩.৮% শিক্ষা খাতে ব্যয় করে। উপরের চিত্র অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে এবং অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় সেই ধারাবাহিকতার কোন হেরফের হয়নি। শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি না করলে কোনক্রমেই ২০১৫ সাল কেন ২০৩০ সালেও সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম সফল হবে না। শিক্ষা খাতকে জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির খাত হিসেবে চিহ্নিত করে শুভংকরের ফাঁকি না দিয়ে শিক্ষা খাতে ইউনেস্কোর সুপারিশমালা কার্যকর করতে হবে। ভারতীয় উপমহাদেশ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের শিশুপ্রতি শিক্ষা খাতে ব্যয়ের একটি চিত্র উল্লেখ করছি। কোরিয়ায় ১৭০ মার্কিন ডলার, মালয়েশিয়ায় ১৫৫ ডলার, ভারতে ১৪ ডলার, পাকিস্তানে ১০ ডলার আর বাংলাদেশে ৫ ডলার। এ হচ্ছে আমাদের শিক্ষার অগ্রগতির নমুনা। শিক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক অঙ্গীকার প্রয়োজন। কোরিয়া, চীন, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া শিক্ষার হায়ুবৃদ্ধিতে শতভাগ সাফল্য অর্জন করেছে। গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত শ্রীলংকায় শিক্ষার হার ৯০%। ভারতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ভিয়েতনামে ব্যয় কম হওয়া সত্ত্বেও ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভের কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষার হার ৯০%-এ উন্নীত করেছে।

১৯৯৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাথমিক পর্যায় শেষে ৪০% শিক্ষার্থীর কোন খোঁজ নেই। মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে দেখা যায়, প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ শিশুর মধ্যে মাত্র ১১ লাখ শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই ঝরে পড়ার সংখ্যা সহজেই অনুমেয়। ঝরে পড়ার হার কমানো এবং ২০১৫ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কতগুলো পন্থা অবলম্বন করা জরুরি। ৬ বছর থেকে ১৪ বছরের প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ শিশু শ্রমিককে স্কুলগামী করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং ওইসব শিশু শ্রমিক পরিবারকে অর্থ সাহায্য করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শহর ও গ্রামে একই ধরনের নতুন বই প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মিড ডে খাবার ও গরিব শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেস প্রদান করতে হবে। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার সুবিধার্থে বছরে অন্তত ১০ হাজার স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দের সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে সেজন্য প্রতিটি স্কুলে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানাবিধ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। ৮ কোটিরও ঊর্ধ্বে যে বয়স্ক নিরক্ষর লোক রয়েছে তাদের মৌলিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য সরকারকে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশে ১০ লাখের ওপরে শিক্ষিত বেকার রয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে তাদের কাজে লাগানো যায়। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বয়স্ক শিক্ষার জন্য রাত্রিকালীন স্কুল চালু করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে যেখানে পর্যাপ্ত স্কুল নেই সেখানে সচ্ছল ব্যক্তিদের দহলিজ ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের সরকারি হরেক রকমের কাজ বাদ দিলে তারাও রাত্রিকালীন স্কুলে ক্লাস নিতে উৎসাহবোধ করবেন। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ালে মাত্র পাঁচ বছরের কম সময়ে নিরক্ষরতা শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসা সম্ভব। তার প্রমাণ চীন, ভিয়েতনাম ও শ্রীলংকা। গবেষণায় দেখা গেছে, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন পরিবারের ঝরে পড়ার হার নিরক্ষর পরিবারের চেয়ে অনেক কম। সাক্ষরতাসম্পন্ন মাতা-পিতা শিশুকে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী। শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের শিশুমৃত্যুর হারও নিরক্ষর মায়ের চেয়ে কম। তারা পুষ্টিহীনতায় কম ভোগে এবং তাদের জন্মনিয়ন্ত্রণ হারও অধিক। কাজেই শিক্ষা জাতির উন্নয়নের চাবিকাঠি। মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নেই। 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্য অর্জনের জন্য, জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে ইউনেস্কোর সুপারিশমালা অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা এবং ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

জয়নুল আবেদীন : *শিক্ষক নেতা*